বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়

সীতানন্দ কলেজ

বাংলা স্নাতকোত্তর স্তরের ছোটোগল্পের বিশেষ আলোচনার জন্য প্রদত্ত গবেষনার নিবন্ধ

বিষয় :-

নারীর স্বরূপ :- প্রসঙ্গ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বউ'

গবেষক :- মৈত্রী মাইতি

রোল :- PG/VUEGS49/BNG-IIIS নং :- 2118

রেজিস্ট্রেশন নং :- 1490102 of 2018-2019

শিক্ষাবর্ষ :- ২০২২-২০২৩

তত্ত্বাবধায়ক :- বিশ্বজিৎ মাইতি

নন্দীগ্রাম :: পূর্ব মেদিনীপুর

Scanned with CamScanner

শিরোনাম

নারীর স্বরূপ:- প্রসঙ্গ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বউ'

গবেষনা তত্ত্বাবধায়ক
তারিখ :- ২৩.৩.২০২৩

গবেষক পরিক্ষার্থীর নাম
তারিখ :- ২৩.০৩.২০২৩

Scanned with CamScanner

সূচিপত্র

সিরিয়াল নং	বিষয়	পৃষ্ঠা নং
১.	Abstract (সারসংক্ষেপ)	১- ৩
২.	Discussion(আলোচনা)	৪-১১
৩.	Conclusion (উপসংহার)	১২
৪.	References (গ্রন্থপঞ্জি)	১৩

Scanned with CamScanner

Abstract : (সারসংক্ষেপ)

নারী সম্পর্কে বাংলা সাহিত্যে অতি প্রাচীনকাল থেকে বর্তমানকাল পর্যন্ত বহু রচনাই পাই। নারীকে পত্নী রূপে, মাতা রূপে, কন্যা রূপে, প্রেমিকা রূপে কল্পনা করে, সাহিত্যিকরা বহু বিচিত্র সাহিত্য রচনা করে আসছেন চিরকাল। তা সত্বেও নারীর স্বরূপটি কখনো নিরপেক্ষ, নির্মোহ সামগ্রিকতায় সাহিত্যে প্রতিফলিত হওয়ার সুযোগ পায়নি কারন পুরুষতান্ত্রিক মনোভাবে নারীকে দেখার প্রবনতায় নারীকে কখনো 'নরকের দ্বার' কখনো বা 'দেবী' রূপে কল্পনা করেছে পুরুষতান্ত্রিক মনোভঙ্গী। এই সাপেক্ষেই মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বউ' নামক গল্প গ্রন্থটির গল্পগুলি অবলম্বনে আমি দেখার চেষ্টা করেছি। 'বউ' সূত্রে নারীর মনস্তত্ত্ব, নারীর উপর সামাজিক পারিবারিক ধর্মীয় চাপের স্বরূপ, বস্তুত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর বৈজ্ঞানিক নির্লিপ্ত দিয়েই যেন 'বউ' নামক বিষয়টিকে রোমান্টিক মনোভঙ্গীতে না দেখে পুরুষতন্ত্রের বাস্তবতায় দেখার চেষ্টা করেছেন। মানিকের নারীকে দেখার স্বাধীন, স্বতন্ত্র স্বরূপটি এই গ্রন্থের গল্পগুলির নারী চরিত্র বিশ্লেষণের মাধ্যমে দেখার চেষ্টা করেছি।

'বউ' গল্পটির সঙ্গে ওতোপ্রতোভাবে সংযুক্ত 'বর' শব্দটি। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর **'বউ'** নামক গল্পগ্রন্থে **'দোকানির বউ', 'কেরানির বউ', 'সাহিত্যিকের বউ', 'বিপত্নীকের বউ', 'তেজি বউ', 'কুষ্ঠরোগীর বউ', 'পূজারীর বউ', 'প্রৌঢ়ের বউ', 'সর্ববিদ্যাবিশারদের বউ', 'অন্ধের বউ', 'জুয়াড়ির বউ'** নামে মোট তেরোটি গল্পের একটি সংকলন প্রস্তুত করেছেন। আমার বর্তমান গবেষণা প্রকল্পটি এই গ্রন্থের গল্পগুলিকে অবলম্বন করে গড়ে তুলেছি।

গবেষণা প্রকল্পের বিষয় হিসেবে এই গ্রন্থটি গ্রহণ করার প্রাথমিক কারণ গ্রন্থ নামের অভিনবত্ব। দাম্পত্য সম্পর্ক সাহিত্যের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অবলম্বন। অতি প্রাচীনকালে প্রাকৃত পৈঙ্গলে এর উদাহরণ পাই —

"ওগগর ভত্তা / রম্ভ অ পত্তা / গাইক ঘিত্তা / দুগ্ধ সজ্জত্তা।
মোইনি মচ্ছা / নালিচ গচ্ছা / দিগ্গই দত্তা / গাই পুনবত্তা।"

বস্তুত দাম্পত্যের মাধুর্যই প্রাচুর্য ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে লক্ষ্য করতে পারি।

Scanned with CamScanner

আধুনিক কালপর্বে মধুসূদনের বীরাঙ্গনায় দাম্পত্য সূত্রে স্বামী স্ত্রীর সম্পর্কের স্বরূপটি নবজাগরণের নারী প্রগতি সম্পর্কিত ধারনা সম্বলিত। সেই কারনে বৃহত্তর সামাজিক প্রেক্ষাপটে নারী প্রগতির ভাবনার অংশ হিসেবে এই দাম্পত্য সাধারণ সাংসারিক গণ্ডির ভেতর বাস্তবতায় রূপায়িত হয়নি।

পরবর্তীকালে বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে দাম্পত্যের বহু বিচিত্র রূপ বৃহত্তর প্রেক্ষাপটে, বৃহত্তম জীবন ভাবনা সম্বলিত ভাবে প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর **কপালকুণ্ডলা - নবকুমার, চন্দ্রশেখর - শৈবালিনী, সূর্যমুখী - নগেন্দ্র, ভ্রমর - গোবিন্দলাল** প্রমুখ চরিত্রের দ্বারা দাম্পত্য সম্পর্কের বিস্তৃত বৈশিষ্ট্য ও বিরাটত্ব শিল্পসৌন্দর্যে প্রকাশিত হয়েছে। পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর উপন্যাস ও ছোটগল্পে দাম্পত্যের চিত্রনে অঙ্কন করেছেন বৃহত্তর পারিবারিক ও সামাজিক প্রেক্ষাপটে, বিচিত্র জীবনবোধের প্রকাশের তাগিদে। কিন্তু এদের ক্ষেত্রে চরিত্রগুলি এসেছে উচ্চবিত্ত ও অভিজাত সমাজ থেকে। রাজা, জমিদার প্রভৃতি উচ্চবিত্ত ও সম্প্রদায়ের নর-নারীর দাম্পত্য লিপিবদ্ধ করার ফলে মধ্যবিত্ত বা নিম্ন মধ্যবিত্তের অর্থনৈতিক সংকট, মানব গঠন তার সমাজ নীতিকে নিরপেক্ষভাবে মেনে নেওয়ার প্রবনতা লক্ষ্য করতে পারি না।

এই প্রেক্ষাপটে 'Belated Kolloliam' মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'বউ' নামের গল্পগ্রন্থে বিচিত্র পেশার, বিভিন্ন বয়সের নর-নারীর দাম্পত্য সম্পর্ককে বহুবিচিত্র স্বরূপে উপস্থিপিত করেছেন বাঙালি পাঠকের নিকট।

গল্পকার হিসেবে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পূর্ববর্তীকালে **'অতসী মামী', 'প্রাগৈতিহাসিক', 'সরীসৃপ'** প্রভৃতি গল্প রচনা করেছেন — মানব অস্তিত্বের সংকট এবং নানা চরিত্রের অন্তঃনারী বিমূঢ় মনস্তত্বের রূপায়ন ঘটেছিল এই গল্পগুলিতে। কিন্তু ১৯৪০ এ **'বৌ'** গল্পগ্রন্থটি প্রথমে আটটি গল্পের সংকলন ছিল। ১৯৫৩ তে আরো পাঁচটি গল্প নিয়ে মোট তেরোটি গল্পের সংকলন এই গ্রন্থ।

'বৌ' নিয়ে আরো কয়েকটি গল্প লেখার পরিকল্পনা ছিল লেখকের। অবিস্বামীর বউ, স্নেহ প্রবনের বউ, চোর বউ, চাষার বউ গল্পগুলির অসমাপ্ত পাণ্ডুলিপি পাওয়া যায় পশ্চিমবঙ্গ বাংলা অ্যাকাদেমিতে। তেজী বউ গল্পের প্রথম নামকরন ছিল **'সুমাতা'**

Scanned with CamScanner

১৯৫৮ তে দিল্লির পিপলস পাবলিশিং হাউস দেবী প্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় যে গল্প সংকলনটি প্রকাশ করেছিলেন, তার নাম ছিল 'Primeval and other stories'

'সমুদ্রের স্বাদ' সংকলনের ভূমিকায় তিনি লিখেছিলেন মিথ্যার শূন্যকে মনোরম করে উপভোগ করার নেশায় মর-মর এই সমাজের দাতরানি গভীর ভাবে মনকে নাড়া দিয়েছিল। ভেবে ছিলাম, ক্ষতে ভরা নিজের মুখখানাকে অতি সুন্দর মনে করার ভ্রান্তিটা যদি নিষ্ঠুরের মতো মুখের সামনে আয়না ধরে ভেঙে দিতে পারি, সমাজ চমকে উঠে মলমের ব্যবস্থা করবে। ... পথ খুঁজে না পাই, পথের ইঙ্গিত জেনেছিলাম। তাই দরদ দিয়ে নির্মম আত্ম সমালোচনার মূল্যে আমি আজও বিশ্বাসী।

স্ত্রী পুরুষের একত্রবাস দাম্পত্যের পরিচয়বাহী। তেরোটি নানা ধরনের দাম্পত্যের কাহিনী এই গল্পগুলিতে কেউই নিজের নামে নয়, এসেছে স্বামীর পরিচয়ে। এরা যেন শুধুমাত্র **'বউ'**। আর কোনো পরিচয় যেন এদের নেই। স্বামীদের পেশা, স্বভাব, বয়স দ্বারা এই নারীরা চিহ্নিত। এই বউদের স্বামীরা সামাজিক অর্থনৈতিক দিক থেকে বিভিন্ন স্তরের। তাই তাদের সমস্যা ও সংকটও ভিন্ন ভিন্ন। এই তেরোটি গল্পে লেখক **'বউ'** -দের বিপন্ন অস্তিত্বকে ধরতে চেয়েছেন। নারীদের মনের নিবিড় ইচ্ছাকে কীভাবে ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ সবাই মিলে গ্রাস করে, তারই যন্ত্রণার আলেখ্য এই গল্পগুলি। নারীর পূর্ণতার সন্ধানে, স্বাধীন ভাবে বাঁচার ইচ্ছা পুরুষতান্ত্রিক সমাজে কীভাবে পদদলিত হয় তারই আলেখ্য এই গল্পগুলি। গল্পগুলির বিশ্লেষণের দ্বারা এই বিষয়টি বোঝার চেষ্টা করব।

Scanned with CamScanner

Discussion : (আলোচনা)

'কেরানির বউ' গল্পে কেরানি রাসবিহারী আর তার বউ সরসীর দাম্পত্যও সরল নয়। সরসী সুন্দরী, যৌবনবতী। গল্পের সূচনাতেই রয়েছে তার শরীরী বর্ণনা।

> 'তেরো বছর বয়সেই সরসী টের পায় যে অহংকার করার মতো গায়ের রং তো তার আছেই, কিন্তু আসল রূপ তার গায়ের রঙ নয়। অস্থিমাংসের বিন্যাসে ঘোমটা দিয়া থাকিলে কবিকে সে অনায়াসে মুগ্ধ করিতে পারে। একটু নিচুদরের ব্রহ্মচারীর মনে 'ঘোমটা' খুলিয়া তার মুখখানি দেখিবার সাধ জাগা আশ্চর্য নয়।"

এমনই অসাধারণ শরীরী সম্পর্কে বিশিষ্ট মেয়েটির ষোলো বছর পূর্ণ হওয়ার কয়েক মাস আগেই বিয়ে হয়েগেল। সবদিক থেকে মাঝারি মাপের কেরানির সঙ্গে। সে হয়েগেল 'কেরানির বউ'। কিন্তু এর আগে তো তার একটা অতীত ছিল। সেই অতীতে সুবলকে বোঝার ক্ষমতাও তার তৈরী হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু সামাজিক অনুশাসনে নিজেকে প্রকাশ করার ইচ্ছাকে দমন করতে হয়েছিল। রাসবিহারী আর তার দাদা বনবিহারী এক বাড়িতেই বাস করত। মাসের পয়লা তারিখে রাসবিহারী বরাবর মাহিনার তিনের চারি অংশ দাদার হাতে তুলে দিত। কিন্তু বিবাহের দুই বৎসর পর সেটা কমে কমে অর্ধেক হয়ে গেলে বনবিহারী তাকে পৃথক করে দেয়। সরসী স্বাধীনতা পেল স্বামীর সংসারে এসে। কিন্তু সেখানেও যেন নিজেকে সে আদর্শ স্ত্রী হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে চাইল। রাস্তার ধারে ঘর তাদের। তাই সে পাশের বাড়ির দিকের জানালা পর্দা দিয়ে ঢেকে রাসবিহারীরে বিশেষ করিয়া বলিয়া দিল —

> 'পর্দা সরিয়ো না বাবু, ও বাড়ি থেকে দেখা যায়, ঘরটা একটু অন্ধকার হল কী করব। রাসবিহারী ভাবিল বড়ো বউয়ের কথাটা মিথ্যা নয়। সরসীর একটু বাড়াবাড়ি আছে।'

এ বাড়াবাড়ি এমনই যে কোনো পুরুষ এমনকি বড়ো বউয়ের ভাই এলেও সে নিজেই নিজের উপর আরোপ করেছে। না হলে কোন আকাঙ্খায় সে দুপুর রোদে খালি মাথায়, খালি পায়ে উন্মুক্ত আকাশের নীচে নিজেকে মেলে ধরেছিল। সমাজ সংসারের বিরুদ্ধে তার সুপ্ত প্রতিবাদ কি তার মধ্যে প্রতিশোধস্পৃহাকে জাগিয়া তুলেছিল? মাথার উপর

Scanned with CamScanner

সূর্য আগুন ঢালিতেছে, ছাদের কোথায় এক টুকরো কাঁচ পড়েছিল। তাতে সরসীর পা কেটে রক্ত পড়ছে, কোমরে কোনো মতে কাপড় আটা আছে কিন্তু দেহের ঊর্দ্ধাংশ একেবারে অনাবৃত, সরসীর খেয়াল নেই। মুক্তির আকাঙ্খায় উন্মাদিনী সরসী গলা ফাটাইয়া প্রানপণে চেঁচায় —

'সে যে ঘরের বউ, সে যে বোবা অসহায় ভীরু
স্ত্রীলোক সব ভুলিয়া বুকে যত শব্দ সঞ্চিত হইয়া
আছে, সমস্ত বাহিরে ছড়াইয়া দেয়।'

রাসবিহারী অফিসে, তাই সে স্বাধীন। ছাদে একা দাঁড়িয়ে দেখতে দেখতে একসময় আত্মহননের ইচ্ছাও রাখে। কিন্তু মৃত্যুর পরেও তো তার শরীর সম্পদ সকলের সামনে উন্মোচিত হবে। তার এই কাঁচা সোনার মতো গায়ের রঙে স্থানে স্থানে রক্ত লাগিবে রাস্তার লোক ভিড় করিয়া তার অপরূপ দেহের অপূর্ব অপমৃত্যু চাহিয়া দেখিবে। আত্ম উন্মোচনের এই আকাঙ্খা যেন সব বিধি নিষেধ সাংসারিক অবদমনের বিরুদ্ধে নারীর প্রতিবাদ নিজের অনন্ত দুর্বলতার বিরুদ্ধে এ শুধু তার একটা তীব্র প্রতিবাদ।

'দোকানির বউ' গল্পে সরলা হল দোকানির বউ। সরলার পায়ে সবসময় মল থাকে। মল বাজিয়ে হাঁটে সরলা। চুপি চুপি নিঃশব্দে হাঁটার দরকার হলেও সে মল খুলে রাখে না। উপরের দিকে ঠেলে তুলে মাংসপেশিতে আটকে রাখে। মল আর বাজে না। এই সরলা ব্যবসায়ীর কন্যা, ব্যবসায়ীর স্ত্রী তো হিসেবি হওয়াই স্বাভাবিক। তার উপরে তার পিতার অর্থে পুষ্ট তার স্বামী। তাই স্বামীর উপর নজর রাখা তো তার কর্তব্য। তার স্বামী শম্ভু তারই সুখ সুবিধার জন্য একান্নবর্তী পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন। তার অভিমান ভাঙাতেই তো আনে দামি শাড়ি, লজেন্স। তাই সরলাও ভাবে যদি সর্বদা লাভ নাই হয় তবু স্বামীর সঙ্গে দোকানদারি আর ভালো নয়।

'বাপের টাকায় স্বামীকে কিনিয়া রাখিয়াছে এক বছর,
এবার তাকে মুক্তি দেওয়াই ভালো, তাতে না হয় হইবে,
তাছাড়া এক বছর ধরিয়া স্বামী তাকে যেরকম
ভালোবাসিয়াছে সেটা শুধু নিজের মনের খুঁতখুঁতানির
জন্য ফাঁকি মনে করা উচিত নয়।'

এই আপোশ অনাগত সন্তানের জন্য? কিন্তু সত্যিই কি সরলা নজরদারি বন্ধ করে

Scanned with CamScanner

দিল? তা তো পারেনি সরলা। কারন সরলা তার স্বামীকে কিনেছে। অদ্ভুত বৈপরীত্যে ভরা এই চরিত্রটি। যৌথ পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েও যৌথ পরিবারকে সে একেবারে ছাড়তে পারে না। সে পার্টিশনের বেড়ার ছিদ্র দিয়ে দেখে তার শ্বশুর পরিবারকে, ষড়যন্ত্র খোঁজে। সন্তান নষ্ট হবার ঝুঁকি নিয়েও শ্বশুর পরিবারের পুরুষদের ষড়যন্ত্র শোনার জন্য জানালায় আড়ি পাতে। লুকিয়ে শোনে ভাসুর, শাশুড়ির সঙ্গে স্বামীর পরামর্শ। জানতে পারে তার স্বামী মুদি দোকান তুলে দিয়ে বাজারে ভাইদের সঙ্গে মনোহারী দোকান খুলতে যাচ্ছে। ভিন্ন হওয়ার আগে ওরা সরলাকে ভীষণ যন্ত্রণা দিত। হিসেবি সরলা এই ষড়যন্ত্রকে নস্যাৎ করে দেয় নিজের টাকা নিজেই চুরি করে। মুখে অবশ্য স্বামীকে বলে সে —

'বাবা টাকা যদি নাই দেয়, দেবে ঠিক, যদির
কথা বলছি - আমি গয়না বেচে তোমায়
টাকা দেব।'

স্বামী যা করছিল তাই করতে থাকে। সরলারও 'মলের ঝমর ঝমর' শব্দের প্রয়োজনীয়তা শেষ হয়। সরলা চরিত্রটি অসাধারণ হয়ে ওঠে তার ষড়যন্ত্রকারী মানসিকতায়। তার কর্তৃত্বপরায়নতায়। এ দাম্পত্যে প্রেম নয়, অর্থই প্রধান। এই অর্থের অধিকারেই সরলা কর্ত্রী হয়ে ওঠে।

'কুষ্ঠরোগীর বউ' গল্পের নামেই প্রমান হয়ে যায়, গল্পের কেন্দ্রীয় লক্ষ্য ও চরিত্র হল মহাশ্বেতা। তার চরিত্র নির্মাণে তার মনোলোকের যে অসামান্য চমৎকারিত্বপূর্ণ বিবর্তচিত্র লেখক এঁকেছেন, বাংলা ছোটগল্পে এই জাতীয় চরিত্র কাঠামো দ্বিতীয় রহিত। মহাশ্বেতা আমাদের গভীর বিস্ময় জাগায়। এরকম একটি ইস্পাত কঠিন নারী চরিত্র বাংলা ছোটগল্পের ধারায় নিশ্চিত অমূল্য সংযোজন। গল্পের প্রথম দিকে যতীনের কুষ্ঠ হয়েছে এমন বিশ্বাস যখন এতটুকুও হয়নি, সন্দেহও জাগেনি সে বিষয়ে, তখনকার স্বামীর সামান্য অসুখ ভেবে মহাশ্বেতার যে প্রেম স্বভাব প্রকাশের সারল্য ও রোমান্টিক অন্তরঙ্গ দাম্পত্যের আবেগ ধর্ম, তা চরিত্রের ব্যক্তিত্বের এক মধুর লাবণ্যকে তুলে ধরে।

এর পরেই ডাক্তারদের কথায় যতীনের কুষ্টই প্রমানিত হলে মহাশ্বেতার মনের গভীরে এক বড় ধাক্কা লাগে :

Scanned with CamScanner

'মহাশ্বেতা যেন মরিয়া গিয়েছে, অন্যায় অসঙ্গত অপমানে
যন্ত্রণা পাইয়া সদ্য-সদ্য মরিয়া গিয়াছে।'

এরপর থেকেই মহাশ্বেতার মনের গভীরে এক এক করে লক্ষণীয় বদল হতে থাকে। কিন্তু তা তাকে স্বামী থেকে বিচ্ছিন্ন করেনি একবারও। কুষ্ঠ এমন এক ব্যাধি, এবং তাও আবার তার নিজের স্বামীর। একজন নারীর পক্ষেএ যে কত বড় আঘাত, তার পরবর্তী চিত্রে যতীনের সেবায় 'খানিকটা কল বনিয়া যাওয়া মানুষের মতো' হওয়াতেই প্রমান মেলে। সে ক্রমশ হয় নির্বিকার। তার স্বামীর কাছে নির্বাক ও নির্বিকার আত্মসমর্পণ তার জীবন নৈরাশ্যের দিককেই পাথরের ভার চাপায়, যতীন তা বোঝে না। তার স্বামী তার প্রতি ক্রমশ কুৎসিৎ ভাবে ক্রুদ্ধ, সন্দেহপ্রবন হয়ে ওঠে। স্বাভাবিক কারনেই মহাশ্বেতা হয় শীতল, শান্ত রাতে যতীনের ঘর থেকে যখন স্বামীর অসঙ্গত ব্যবহারের জন্য অন্য ঘরে শোয়ার ব্যবস্থা করে দূরে সরে আসে, তখনই তার মধ্যে জাগে জীবনের কোন একটা অবলম্বনের অনুসন্ধিৎসা।

চরিত্রের বদল মনের চিন্তায়। কাজে তা সম্ভব হল যতীনকে কামাখ্যায় একা পাঠিয়ে দেওয়ার পর। তার শুরু কালিঘাটে সর্বহারা ভিখারী ও কুষ্ঠরোগীদের দান ধ্যানের সূচনায়। কুষ্ঠাশ্রম স্থাপনে তার সুস্থ জীবনের অবলম্বনই মেলে। মহাশ্বেতার চরিত্র ব্যক্তিত্বের এই যে অদ্ভুত বদল, এখানেই চরিত্রটির যথার্থ শিল্পন্যায়। সে ক্রমশ সীমার জীবন অসীম জীবনের দিকে এগিয়েছে। গল্পে মহাশ্বেতা যেন গল্পকারের বড় জীবনের এক বাস্তব মিশন। স্বামীর সেবার থেকে অসংখ্য অসুস্থ জীবনের সেবায় যে তার নিমগ্ন হওয়া, এখানেই চরিত্রটির স্বাভাবিক পরিনতি চিত্র। মহাশ্বেতার সম্যক ও সম্পূর্ণ মানবী মূর্তি রচনাতেই গল্পকারের কৃতিত্ব এবং শিল্পের চমৎকৃতি।

যতীন চরিত্রের মূলে আছে এক কুষ্ঠরোগাক্রান্ত সচ্ছল সুদর্শন পুরুষের জটিল অর্ন্তদ্বন্দ্বের করুন রূপ। তার অস্থিরতা ও অসহায়তা তাকে মনস্তত্ত্বের গভীর রহস্যে জীবন্ত ও বাস্তব করে তুলেছে। তার রোগ শুধু বাইরের সম্পর্কেই মানুষে মানুষে ব্যবধান রচনা করে না, অন্তরের মধ্যেও এক নিষ্ঠুর বিচ্ছিন্নতাকে তৈরি করে। স্ত্রী মহাস্বেতার সঙ্গে তার যে মানসিক ব্যবধান ক্রমশ প্রকট হতে থাকে, একজন সচেতন কুষ্ঠরোগী পুরুষের পক্ষে তার সবটাই মনগড়া। যতীনের কুষ্ঠরোগ স্ত্রী হিসেবে

Scanned with CamScanner

মহাশ্বেতা স্বামীকে সান্ত্বনা দিতে জানায়, তা তারই ভাগ্যের লিখন, স্বামীর কোন পাপ নয়। কিন্তু মানসিক বিকৃতিতে যতীনের কুৎসিৎ ভিন্ন মূর্তি :

'যতীন আজ প্রানপণে চেঁচাইয়া বলে, 'তোমার পাপে
আমার এমন দশা হয়েছে, ছেলে-খেকো রাক্ষসী। তুমি
মরতে পারোনি? না, সাধ আহ্লাদ এখনো মেটেনি?
এখনো বুঝি একজন খুব ভালোবেসেছে?'

এই যে মনোধর্মে যতীনের পাঁকের মধ্যে পতন, তাই তার রোগী হিসেবে বাস্তবতার দিক। শুধু দেহে নয়, মনেও সে কুষ্ঠরোগীর দেহের পচা-গলা রূপ নিয়ে দিন কাটায়। তার সন্দেহ, রাগ, আত্মরতির মধ্যে মহাশ্বেতার প্রতি অপমানকর মন্তব্য তাকে দেহের অসুস্থতার থেকেও আরও জঘন্য রোগীতে পরিনত করে।

ঈশ্বর, দৈবাদেশে বিশ্বাস ইত্যাদিতে এককালের অনীহ যতীন ক্রমশ মাদুলী, মন্ত্রপুত ফুল ইত্যাদিতে বিশ্বাস করতে থাকে। তার চরিত্র পরিনতির দিক থেকে এ-ও এক পতনের ভয়াবহ রূপ। ডাক্তার যখন মহাশ্বেতাকে বিশ্বাস করায়, 'বংশের রক্তধারার সঙ্গে পুরুষানুক্রমে মিশে থাকে এমন রোগ একটা নয়, মিসেস দত্ত।' তখনি যতীনের রোগ সম্পর্কে তার হতাশার ধারনা বদ্ধমূল হয়ে যায়, আর তার পরেই সে শান্ত থেকে বুদ্ধিতে নির্ভর করে জীবনের দিকে ফেরে নিজের বড় জায়গায় দাঁড়াবার জন্য। কুষ্ঠাশ্রমে মহাশ্বেতার যতীনের প্রতি যে আচরণ, তা যতীনের নিঃসঙ্গতা, স্ত্রীর সঙ্গে চিরকালীন অন্বয়ের বেদনা, দুঃখ ও আর্তিকে বিষাদমন করে। যতীন হয়ে যায় একক সত্তায় মৃত, মহাস্বেতা বহুর জীবনে সপ্রাণ। আদিতে যতীন ছিল যথার্থ অর্থে মহাশ্বেতার প্রিয়তম স্বামী, গল্পের শেষে যতীন আর স্বামী হয়ে নেই, একজন কুষ্ঠরোগগ্রস্থ সাধারণ রোগী। যতীনের ঠাকুর, দেবতা ও মাদুলী মন্ত্রপূত ফুলে গভীর বিশ্বাস আবার মহাশ্বেতাকে অস্থির করবেই। এই ভাবনাতেই বৃহৎ মানবধর্মে মহাশ্বেতা তাকে অস্বীকার করেছে গল্পের শেষে। এখানেই মহাশ্বেতা প্রতিবাদী, এখানেই সে অন্য বউদের থেকে পৃথক। তার ব্যক্তিগত যন্ত্রণাকে সে সমাজের ঘৃণিত, অবহেলিত মানুষের সেবায় নিয়োজিত করেছে। যে সমাজ নারীকে দাসীর আসন দিয়েছে, সেই সমাজের ব্যাধিগ্রস্ত মানুষের নিরাময়ের জন্যই সে দু-হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। এখানেই সে অনন্যা।

Scanned with CamScanner

'বিপত্নীকের বউ' প্রতিমা এক আশ্চর্য চরিত্র। তার প্রতিদ্বন্দ্বী মৃতা সপত্নী। তাকে প্রতি মুহূর্তে বারংবার মনে করিয়ে দেওয়া হয় সে বিপত্নীকের বউ। অর্থাৎ সকলেই তাকে প্রতিমা হিসেবে নয়, প্রতিমার স্বামী রমেশের মৃতা স্ত্রীর ছায়া হিসাবে গ্রহণ করে। তার যেন নিছক কোনো অস্তিত্বই নেই। পরিবারের সকলেই তার অঙ্গ প্রতঙ্গের সঙ্গে তাদের মৃতা বধূটির চেহারার সাদৃশ্য খুঁজে পায়। যদিও এ মিল একেবারেই তাদের কল্পনাপ্রসূত। তার স্বামীও তাকে ভালোবেসে গ্রহণ করেনি। সে নারী। তাই তার উচিত পরিবারের যোগ্য করে নিজেকে গড়ে তোলা। সে চেষ্টাতেই সে মগ্ন। এক সময় সে সত্যি নিজেকে মৃতা সপত্নীর ছায়া হিসেবে ভাবতে শুরু করে। কিন্তু এতে কি সমস্যা শেষ হয়? সংকটের সূচনা তো এখানেই। যে রমশে তার মধ্যে এতদিন মৃতা পত্নীর অন্বেষণ করেছে, সে এখন তাকে গ্রহণ করে 'প্রতিমা' হিসাবেই। তার নিজস্বতাকে, স্বতন্ত্র অস্তিত্বকে মূল্য দেয় তার স্বামী রমেশ, ভালোবেসে তাকেই। এখানেই সংকট। প্রতিমা আহত হয়। কারন প্রতিমা তো আজ অন্যের ভূমিকায়। চিত্রাঙ্গদা ফিরতে চেয়েছিল নিজের ভূমিকায়, আর প্রতিমা তিল তিল করে নিজেকে করে তুলেছে সপত্নীর প্রতিমা।

'রাজার বউ' গল্পে রাজা ভূপতি এবং তার তথাকথিত রানি যামিনীর দাম্পত্যের চিত্র রয়েছে। যৌবনে তারা রাজা এবং রানী হয়ে বনেদি চালচলনে নিজেদের প্রকাশ করে। এমনকি তাদের প্রেমেও তাদের পদমর্যাদা তারা নিয়ন্ত্রণ করে। কিন্তু 'সব পাখি ঘরে আসে সব নদী ফুরায় এ জীবনের সব লেনদেন। থাকে শুধু অন্ধকার মুখোমুখি বসিবার।' যখন সত্যিই তারা কর্তব্যকর্ম সমাপ্ত করে মুখোমুখি হল তখন শেষ হয়ে গেছে তাদের চাওয়া পাওয়ার ইচ্ছেগুলো। অন্তরের দাবির নিঃস্বতা এখানে দাম্পত্যকে গ্রাস করেছে। ভূপতি যাহা চায় তার মধ্যে তাহা আছে, তাহাদের সেই অনির্বচনীয় অতৃপ্ত প্রেম। কিন্তু তার নাগাল পাইতেছে না। একদিন হয়তো যামিনীর কল্পনা থামিয়া যাইবে, হয়তো আকুল হইয়া আজ রাত্রেই অন্ধকারে সেই এই বাস্তব ভূপতিকে খুঁজিবে, কিন্তু ভূপতি তখন হয়তো জাগিয়া নাই। আবার কালরাত্রে ভূপতি যখন আলো জ্বালিয়া অপলক চোখে তার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিবে, সে হয়তো তখন ঘুমাইয়া আছে। একসঙ্গে তারা যে আজ পরস্পরকে দাবি করিবে তার বাধা অনেক।

Scanned with CamScanner

'উদার চরিতনামের বউ' গল্পে শতদলবাসিনী ও যতীনের দাম্পত্যের কাহিনী জানব। পুরুষ যখন বিবাহ করতে চায় তখন সে হিন্দু বিবাহের প্রচলিত আচারকে উচ্চারণ করে 'তোমার জন্য দাসী আনতে যাচ্ছি'। নারী তো দাসীই। তার ভরণ পোষণের দায়িত্ব নেয় পুরুষ। ইংল্যাণ্ডে বহুদিন পর্যন্ত স্ত্রীরা স্বামীকে লর্ড বলে সম্বোধন করত। সংস্কৃতে দেখি ভৃত্য ও ভার্যা একই ধাতু থেকে উৎপন্ন। তাই 'উদার চরিতানামের বউ' গল্পে স্বামী যখন স্ত্রী শতদল বাসিনীকে দিয়ে পদসেবা করায়, তখন হিন্দু শাস্ত্র অনুযায়ী তা অন্যায় হয় না। পুরুষ তো স্ত্রীকে সম্পত্তি মনে করবেই এমন অধিকার তো শাস্ত্র তাকে দিয়েই রেখেছে। স্বামী যতীন এখানে সকলের সঙ্গে সুন্দর সুন্দর উদার ব্যবহার করেছে। কিন্তু স্ত্রীর উপরে মানসিক অত্যাচার করেছে। যৌন নিপীড়নেও দ্বিধা করেনি। কারন স্ত্রী তার সম্পত্তি। শুধু স্ত্রী নয়, নিজের মায়ের সঙ্গেও সে দুর্ব্যবহার করে। কিন্তু পরিবারের বাইরের লোকের কাছে তার চরিত্রের উলটো দিকটা তুলে ধরে। পাতানো পিসির সঙ্গে সে মধুর ব্যবহার করে। অপরের বোনের বিবাহে অর্থ সাহায্য করে, কিন্তু নিজের বোনের বিবাহে তার টাকার জোগাড় হয় না। অপাত্রে বোনের বিবাহ স্থির করে। গর্ভবতী স্ত্রীকে রান্নার সমালোচনা করে বাড়ি থেকে বিতাড়নের হুমকি দেয়। নারী কত অসহায়। পিতৃগৃহ ত্যাগ করে পতিগৃহে আসে সে — কিন্তু এখান থেকেও সে বিতাড়িত হতে পারে। বস্তুত তার নিজস্ব কোনো বিকল্প নেই। সে তো দাসী। তাই সারাদিনের পরিশ্রমের পর শ্রান্ত শতদলবাসিনী ঘুমন্ত স্বামীর পদসেবা করে। স্বামীর সমস্ত অনাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী মন তার বিদ্রোহী হয়ে উঠতে চায় মাঝে মাঝে, কিন্তু পারে না। কারন হাজার বছরের সংস্কারের দাসত্ব নারীর ভিতরে। আর আমাদের পুরুষতান্ত্রিক সমাজের গঠন তো এমনটাই।

সমাজ নির্ধারিত বিবাহ নামক প্রতিষ্ঠানে নারী-পুরুষের যৌথ জীবনে পুরুষ কর্তা, নারী দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ। পুরুষের হাতে সুতো, নারী ক্রীড়নক। সুতরাং এই বৈষম্যমূলক অবস্থানগত সম্পর্কের ক্ষেত্রে মনস্তাত্ত্বিক জটিলতা তো অবশম্ভাবী। এই অবস্থানগত বৈষম্যে নারী-পুরুষের জীবনজিজ্ঞাসার পার্থক্যও স্বাভাবিক। এ গ্রন্থের 'বউ' দের অস্তিত্বের সংকটকে তিনি ধরতে চেয়েছেন পুরুষতান্ত্রিক সমাজের প্রেক্ষিতে। তেরোটি গল্পেই নারী শোষণের শিকার হয়েছে কখনো পরোক্ষ, কখনো প্রত্যক্ষে। নারীর স্বতন্ত্র অস্তিত্ব সতত বিপন্ন। এই বিপন্ন অস্তিত্ব ফুটে উঠেছে গল্পগুলিতে। মনে

Scanned with CamScanner

মনে সকলেই প্রতিবাদী হয়েছে। শতদলবাসিনীর মতো কেউ প্রতিবাদী মনকে সংসারের দাসত্বে দমন করেছে, কেউ বা নিজের মতো করে প্রতিবাদী হয়েছে। তবে কেউই বিবাহ নামক চুক্তিভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থায় স্বামী পরিত্যাগের সাহস দেখাতে পারেনি, ব্যতিক্রম মহাশ্বেতা। প্রতিবাদে কেউ গর্ভস্থ সন্তাকে নষ্ট করতে চেয়েছে, কেউ আত্মহননের সংকল্প নিয়েছে. কিন্তু মহাশ্বেতা বাঁচতে চেয়েছে, সমাজের পচাগলা অবক্ষয়িত শরীরটাকে নিরাময়ের চ্যালেঞ্জ নিয়ে বাঁচতে চেয়েছেন মহাশ্বেতা। মার্কসীয় তত্ত্বের শোষক শোষিতের সম্পর্ক বা ফ্রয়েডীয় মনস্তত্ত্বের অবদমিত যৌনতা বা যৌন তত্ত্বে না গিয়েও বলা যায় তেরোটি গল্পে নানা ধরনের দাম্পত্যের জটিল মনস্তাত্ত্বিক চিত্র তুলে ধরেছেন লেখক। বোঝা যায় আধুনিক মননশীল লেখক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় নিজে নারীকে ব্যক্তি মানুষ হিসাবে স্বতন্ত্র মর্যাদা দিয়েছেন বলেই তাদের শোষিত চিত্ত, জীবন যন্ত্রণা প্রতিবাদী মন, প্রতিশোধস্পৃহা, না পারার বেদনাকে সহানুভূতির সঙ্গে চিত্রিত করতে পেরেছেন।

Scanned with CamScanner

Conclusion : (উপসংহার)

রবীন্দ্রোত্তর বাংলা সাহিত্যের একজন উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক ছিলেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। সাধারণ জনগণের জীবনে থাকা সুখ, দুঃখ, স্বপ্ন, আশা, নিরাশা ইত্যাদি সকল রকম পরিস্থিতি তাঁর রচনায় গভীরতার সাথে ফুটে উঠেছে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় আত্মপরিচয়ে নিজের সাহিত্য সৃষ্টি সম্পর্কে বলেছেন যে —

'সচেতনভাবে বাস্তববাদের আদর্শ গ্রহণ করে সেই দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে সাহিত্য করিনি বটে, কিন্তু ভাবপ্রবনতার বিরুদ্ধে প্রচণ্ড বিক্ষোভ সাহিত্যে আমাকে বাস্তবকে অবলম্বন করতে বাধ্য করেছিল।'

দুঃখ দারিদ্রে জর্জরিত নর-নারীর অমন জীবন্ত আলেখ্য এর আগে অন্য কোনোও বাঙালি সাহিত্যিকের রচনায় ফুটে ওঠেনি। অথচ এই স্তরের অবহেলিত মানুষদের মধ্যেই রয়েছে অসংরক্ষিত অমসৃণ কত হীরক খণ্ড। এরকম সমস্ত আপখোরাকী লোকদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিশতেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। তাদের জীবনযাত্রায় শামিল হতে গিয়ে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। তার বহুবিধ অভিজ্ঞতার কথা রয়েছে তাঁর রচিত প্রতিটি রচনায়।

'বউ' গ্রন্থটি রচনার অব্যবহিত পরবর্তীকালেই সংগ্রামী জীবনের একজন সার্থক রূপকার মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, তিনি দীক্ষিত হয়েছিলেন মার্কসবাদে। তার সাহিত্য রচনা সূচনার মধ্য দিয়ে এই প্রভাব অতি স্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত হয়। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় অধিকাংশ রচনাতেই মার্কসবাদ ও ফ্রয়েডীয় মতবাদের দৃশ্যমান প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। বস্তুতঃ এই মার্কসবাদই লেখককে মধ্যবিত্ত সুলভ ভাব প্রবনতার গণ্ডি উত্তরন করার পথ নির্দেশ করেছে।

Scanned with CamScanner

Referances: (গ্রন্থপঞ্জি)

আকর গ্রন্থ ঃ

বউ - মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

সহায়ক গ্রন্থ ঃ

১। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়; জীবন দৃষ্টি ও শিল্পরীতি

২। বাংলা উপন্যাসের কালান্তর — সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়

৩। প্রসঙ্গ বাংলা ছোটগল্প ও গল্পকার — বীরেন্দ্র দত্ত

৪। কালের পুত্তলিকা — অরুণ কুমার মুখোপাধ্যায়

৫। আমার কালের কয়েকজন কথাশিল্পী — জগদীশ ভট্টাচার্য

সহায়ক পত্রিকা ঃ

১। দিবারাত্রির কাব্য — মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সংখ্যা আফিফ ফুরাদ

২। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সংখ্যা — পশ্চিমবঙ্গ

২৩.০১.২৩

Scanned with CamScanner